Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, published on July 2024, Page No. 257 - 263
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ : ‘নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে’

মৌসুমী বনিক
গবেষিকা, ইতিহাস বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID : banerjeebanikmousumi@gmail.com

Received Date *16. 06. 2024*
Selection Date *20. 07. 2024*

Keyword
British colonialism, patriotic, partition, Religion, Nil Kantho Pakhir Knonje, Bengali novel.

Abstract
India was free from British colonialism on 15th August, 1947. As Indian we feel a sense of patriotic and pride on 15th August in every year. But it hides another real fact of our freedom which is the partition of India as well as Bengal (1947). As a result of partition both the Hindu, and Muslim communities had to pay the price of freedom. Religion based terrible murder, rapes create permanent wound in the social life of the Bengalis. With scared and afraid many people leave their mother land and move to another country to spend their life without harassment. Strangely the issue of partition was neglected in Bengali literature for a long time. May be the society of that time did not have the context that was needed to highlight the real and touching issue like partition in literature. In addition, there were differences of opinion among the writers. They could not identify the responsibility factor which was considered as the sensitive issue like partition of our country. Whether it was in 1950 or 1970 Indians believed the British were responsible for the famine. Therefore, many literatures were written about the famine at that time by easily blaming the British. But in a sensitive matter like partition, it was not possible to absolve responsibility by blaming only the British because all the Hindu, Muslim, Sikhs communities were involved in bloody riots to protect their own interests.

Therefore, a kind of ambivalence and dilemma, mental conflict worked in the minds of the Bengali nation for indentifying the main reason for partition. The Bengali novel, which is a mixture of subtlety and reality, is written two decades after the partition and occupies a special place in our minds that is ‘Nil Kantho Pakhir Knonje’ Bengali novel written by Atin Bandopadhyay (1971). With the help of this partial autobiographical novel, we will explore in the coexistence of Hindus and Muslims in East Bengal before independence daily living life and side by side standing by with each other’s happiness and sorrows from conflict of class to interest etc. At the same time, we will try to find out the reasons of how the ‘sudden gain of Independence ‘shook the roots’ of the common people in the form of partition.

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 257 - 263
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Discussion

ভারতবর্ষ ১৯৪৭ সালের ১৫ই অগাস্ট ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার হাত থেকে মুক্তি পায়। দেশ স্বাধীনতা লাভ করে। ভারতবাসী হিসেবে ১৫ই অগাস্ট দিনটি একদিকে যেমন আমাদের মনে দেশাত্ব বোধ ও গর্বের এর জন্ম দেয়, তেমনি অপর একটি অতিবাস্তব ঘটনাকে আড়াল করে চলে। সেই অতি সত্য ঘটনাটি হল দেশভাগ। দেশভাগের মর্মান্তিক পরিনতির অন্যতম সাক্ষী হয়ে, স্বাধীনতার মুল্য চোকাতে হয়েছে ভারতবর্ষের হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়কেই। ধর্মকে কেন্দ্র করে বীভৎস হত্যা, নারী জাতির ধর্ষণ, লক্ষ লক্ষ মানুষের ভিটে মাটি হতে উৎখাত ইত্যাদি বিষয়গুলি বাঙালির জীবনে চিরস্থায়ী ক্ষত সৃষ্টি করে। যা আজও বাঙালী ভুলতে পারে না। কিন্তু খুব অদ্ভুতভাবেই দেশভাগের বিষয়টি বহুকাল ধরে বাঙালী সাহিত্যে অবহেলিত ছিল। হয়তো দেশভাগের মতো বাস্তব, নিদারুন, স্পর্শকাতর বিষয়কে সাহিত্যে তুলে ধরতে গেলে যে প্রেক্ষাপট প্রয়োজন ছিল তা তৎকালীন সমাজে ছিল না। উপরন্তু দেশভাগের মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে কাকে শত্রু হিসাবে বিবেচনা করা হবে তা নিয়েও সাহিত্যিকদের মধ্যে নানা মতভেদ ছিল। কারন পূর্ববর্তী দুর্ভিক্ষ তা সে ছিয়াত্তর হোক বা পঞ্চাশেরই হোক সেখানে শত্রু হিসাবে ব্রিটিশদের চিহ্নিত করা গিয়েছিল তাই খুব সহজেই সেখানে ঐ ঘটনার প্রেক্ষিতে নানা সাহিত্য রচিত হয়েছিল। কিন্তু দেশভাগে তো শুধু ব্রিটিশদের শত্রু হিসাবে চিহ্নিত করে দায়মুক্ত হওয়া সম্ভব ছিল না কারণ হিন্দু, মুসলিম, শিখ, সমস্ত সম্প্রদায়ই নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষার্থে রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা, ধর্ষণ, হত্যা, হানাহানির সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছিল। এখন খুব স্বাভাবিক ভাবেই যদি একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায় নিজের বিপর্যয়, দুর্দিন, নিজদেশ হতে মুলোৎপাটনের ইতিহাস বলতে শুরু করে তবে খুব স্বাভাবিক ভাবেই সংখ্যা গরিষ্ঠ ওপর সম্প্রদায়ের ওপর অনেকখানি দায় বর্তায়। অথচ যেকোন একশ্রেণীর মানুষ বা সম্প্রদায়ের ইতিহাস একপেশে ভাবে লিখলে তা কিন্তু কখনই নিরপেক্ষ ইতিহাস বা ঘটনার সাক্ষ্য দিতে পারবে না কারন ভারতের ইতিহাসে দেশভাগ, স্বাধীনতা লাভ যতটা সত্যি ততটাই সত্যি নোয়াখালীর দাঙ্গা, অথবা বিহার গড় মুক্তেস্বরের দাঙ্গা।

তাই বাঙ্গালীর মনে দেশভাগ ও তার জন্য দায়ী শত্রু চিহ্নিতকরণে এক ধরনের দ্বিধা, দ্বন্দ্ব ও জড়তা কাজ করেছিল। সূক্ষ্মতা ও বাস্তবতার মিশেলে যে উপন্যাসটি দেশভাগের দুই দশক পরে রচিত হয়েও আজও আমাদের মনের মণিকোঠায় এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে তা হল অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা উপন্যাস ‘নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে’ ১৯৭১। এই উপন্যাসের হাত ধরেই আমরা স্বাধীনতার পূর্বে পূর্ববঙ্গে হিন্দু মুসলমান এর একত্র সহাবস্থান, দৈনন্দিন জীবনযাপন, একে অপরের সুখ-দুঃখের ভাগীদার মানুষগুলির রোজনামচা খুবই দক্ষতার সাথে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। হঠাৎ স্বাধীনতা লাভের মূল্য চোকাতে দেশভাগের নিধান সাধারণ মানুষকে কিভাবে শিকড় হতে নাড়িয়ে দিয়েছিল তার বাস্তব প্রতিচ্ছবি এই উপন্যাস। কে দেশভাগের জন্য দায়ী এই প্রশ্নের উত্তর ও খুব সুন্দরভাবে দেয় এই উপন্যাস। এই উপন্যাসে শ্রেণিসংঘাত হতে স্বার্থসংঘাত সবকয়টি স্তরই লেখক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় নিখুঁতভাবে বর্ণনা করেছেন, তাই অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা উপন্যাসেতে দেশভাগ ও তার সাথে জড়িয়ে থাকা হিন্দু মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্কের টানাপোড়েন, স্বার্থের সংঘাত, সুযোগসন্ধানী মানুষের কারসাজি ইত্যাদি কিভাবে আলোচিত হয়েছে তা আলোচনা করব।

‘নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে’ ১৯৭১ সালে জুলাই মাসে প্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। উপন্যাসটি অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের আংশিক জীবনকথাও বটে। লেখক নিজেও পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে একে তার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ বলে স্বীকার করে নিয়েছেন। লেখকের জন্ম ১৯৩০ সালে ঢাকার রাইনাদি গ্রামে। উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের বাস্তব উপস্থিতি ও স্বীকার করেছেন। লেখকের বড় জ্যাঠামশায় মানসিক ভাবে অসুস্থ ছিলেন। সামু পাশের গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। রঞ্জিত নামক চরিত্রটি তার দূরসম্পর্কের কাকা ছিলেন। ঈশম চরিত্রটির ও বাস্তব অস্তিত্ব ছিল। তবে প্রয়োজন বোধে লেখক অনেক নতুন চরিত্রও সৃষ্টি করেছেন। তবে লেখক একথাও স্বীকার করেছেন যে তার দেশত্যাগ কোন তিক্ত ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে না। বরং তারাই প্রতিবেশী দের ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেন নি। অস্থির সময়, রাজনৈতিক পরিস্থিতি অনেক সম্পর্কের সমীকরণই বদলে দিয়েছিল।[১]

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 257 - 263
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

উপন্যাসের কিছু অংশ ঔপন্যাসিকের জীবন হতে উঠে এসেছে আবার কিছু অংশে বাস্তব ঘটনার সাথে মিল রেখে কল্পনার মিশেল ঘটানো হয়েছে। উপন্যাসের শুরু ঈশম শেখ কে দিয়ে যিনি ঠাকুর বাড়ীর অনুগত ও একনিষ্ঠ ভৃত্য। ঈশম শেখ ও সোনাবাবুর জন্মের মধ্য দিয়ে এই কাহিনীর সূত্রপাত। সোনাবাবুর জন্মের খবর দিতে সে নিশুত রাতে বেরিয়ে পড়ে। ঈশম শেখ এই উপন্যাসে একজন সৎ মানুষ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। অভাব তার নিত্যসঙ্গী, তার ঘরে পঙ্গু স্ত্রী, কিন্তু সে তার স্ত্রীকে নিঃস্বার্থ ভাবে ভালোবাসে। তাই উপন্যাসের শুরুতেই তার প্রতি বড় বৌ এর স্নেহশীলা মনোভাব দেখতে পাই- 'ঈশমের ভাঙ্গা ঘর, পঙ্গু বিবি, নাড়ার বেড়া এবং জীর্ণ বাসের কথা ভেবে বড়বৌর কেমন মায়া হল'।[২]

দেশভাগ প্রসঙ্গেও তার মন্তব্য হিন্দু মুসলিম, জাতপাত, ভেদাভেদ এর উদ্ধে অবস্থান করে। ধর্মের নামে, নিজ নিজ স্বার্থকে চরিতার্থ করার নামে, স্বাধীনতা লাভের নামে ভারতবর্ষকে দ্বিখণ্ডিত করার মূলে ছিল এক শ্রেনীর মানুষের লোভ, ক্ষমতা কুক্ষিগত করার ইচ্ছা এবং রাজনৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক দিক থেকে বলীয়ান হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। ঈশম কিন্তু এই উপন্যাসে ক্ষমতা লিপ্সু, স্বার্থান্বেষী ঐ মানুষগুলোর প্রতিনিধিত্ব করে না বরং উপন্যাসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সে ভৌমিক পরিবারের বিশেষ অনুগত হয়ে থেকেছে। দেশ ত্যাগের সময় গরীব মানুষেরা ফাক পেয়ে সব নিয়ে পালালে ঈশম তা ঘাড়ে ধরে নিয়ে এসেছে।

> "মানুষ তা চোখে কম দেখে আজকাল, অথচ একটা সামান্য জিনিস কেউ না বলে নিয়ে গেলে ঠিক ধরে আনছে।"[৩]

সোনার প্রতি ঈশম এর ভালোবাসা কিন্তু নিখাদ। মেলার দাঙ্গাতে সোনাকে হারিয়ে দুইদিন ধরে বিলের পাশে বসে তার বিলাপ পাঠকের মন কে নাড়িয়ে দিয়ে যায়। শুধু কি সোনা 'পাগল ঠাকুর' এর প্রতিও তার খুব মায়া। তাকে বহু বার ঈশম খুঁজে দিয়েছে। মনীন্দ্রনাথের পাগল হওয়ার দুঃখে দুঃখ করে বলেছে-

> "ভাইরে তোমার আমার ছোটখাট দুঃখ। ঠাকুর বাড়ির দুঃখে চক্ষে পানি আসে।"[৪]

এ যেন নিজ পরিবারের মানুষের জন্য দুঃখ প্রকাশ। ঈশম শেখের চরিত্র গ্রামবাংলার সেই সমস্ত দরিদ্র অথচ বিশ্বস্ত মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে যারা ধর্মের নামে দেশভাগ চায়নি, যারা মনে করে নি শিক্ষা, জমি, ক্ষমতা সমস্তই উচ্চবিত্ত হিন্দুদের কুক্ষিগত সুতরাং তাদের উচ্ছেদ প্রয়োজন। ঈশম শেখ যেন ঠাকুর পরিবারের একজন হয়ে উঠেছিল, ঠাকুরবাড়ির সাথে তার সম্পর্ক ছিল আন্তরিক। খুব স্বাভাবিক ভাবেই দেশভাগকে সে মেনে নিতে পারেনি। বাংলাদেশের নাম পাকিস্তান হওয়াতে সে কষ্ট পেয়েছে। ঠাকুরবাড়ির জমি হাজিসাহেবের কাছে বিক্রি হয়ে গেলে তার মনে হয় এই জমি আর তার নয়। তাই হয়তো ঔপন্যাসিক ঈসম শেখকে তার মৃত্যুর সময় পুনরায় ঐ জমিতে ফিরিয়ে এনেছেন এবং সামুর হাতেই তাকে কবর দেওয়া করিয়েছেন। সেখানে ইস্তেহারে সে যে দেশের নাম লিখেছে তার নাম বাংলাদেশ। ঈশম শেখের মাধ্যমে লেখক এই উপন্যাসে বাংলাদেশের দিন দরিদ্র, অশিক্ষিত, এমন এক সম্প্রদায়ের উপস্থাপনা করেছেন যার মধ্য দিয়ে দেশপ্রেম এক অন্য মাত্রা লাভ করেছে। মৃত্যু আসন্ন জেনেও ঈশম আবার নিজের জন্মভুমিতে অন্ন বস্ত্রহীন অবস্থায় ফিরে এসেছে। "আবার ফিরা আইলাম মা জননী। তর কাছে ফিরা আইলাম।"[৫] ঈশম ধর্ম রাজনীতির উরদ্ধে গিয়ে পাঠককে যেন প্রকৃত স্বাধীনতার অর্থ বোঝাতে সক্ষম হয়। তাই তো তার মৃত্যুর পর তাকে কবর দিয়ে নতুন ইস্তাহার লিখে দেয় সামু, যার নাম 'বাংলাদেশ'।

শুধু ঈশম শেখ নয়, ঈশম শেখের মতোই ঔপন্যাসিক অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় আরও কিছু চরিত্র চিত্রন করেছেন, তার মধ্যে অন্যতম জোটন, আবিদালি, জালালি, ফকিরসাব, মনসুর, জব্বর ও অনান্য। এরা দরিদ্র, প্রায় অশিক্ষিত, এবং শ্রমজীবি সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের মানুষের সাথে উচ্চবিত্ত হিন্দুদের সুসম্পর্কই উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। তবে কিছু কিছু ব্যাতিক্রমও আছে। এরা সাধারণত উচ্চবিত্ত হিন্দুদের জমিতে কাজকর্ম করেই জীবনধারণ করত। তাদের নিজস্ব বিশ্বাস, যোগ্যতা ও আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত, ছিল হিন্দু, মুসলিমের পারস্পারিক সহাবস্থান, ছিল আপদে-বিপদে একে অপরের পাশে দাঁড়ানোর মানসিকতা। তাই অভুক্ত জোটনকে পেটভরে খাইয়ে ভৌমিক পরিবারের কর্তা তৃপ্ত হয়। আবার মালতিকে নরেন

দাসের কাছে পৌঁছে দেবার সময় জটনের স্বামীর ওলাওঠাতে মৃত্যু তার ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে কর্তব্য পালনের, দায়িত্ব পালনের বিষয়টিকেই ফুটিয়ে তোলে। তাই সারাদিন ধরে কচ্ছপের ডিম সংগ্রহের পর জোটন ঠাকুরবাড়িতে এসে তার বিনিময়ে চাল পায়। এখানে ঠাকুর পরিবার কিন্তু ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে বারবার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে।

অপরদিকে ঔপন্যাসিক অবস্থাপন্ন জোতদার শ্রেনির মানুষের চিত্র এঁকেছেন, এরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করার জন্য হিন্দু বিতাড়নে, তাদের সম্পত্তি করায়ত্ত করতে ধর্মকে কাজে লাগিয়েছে। এদের মধ্যে অন্যতম হাজিসাহেব, ব্যাবসায়ী করিম শেখ ও মোল্লা মৌলবিরা। এরা শুধু নিজেরাই হিংসা, ঈর্ষা দ্বারা পরিচালিত হয়নি ধর্মের দোহাই দিয়ে শ্রমজীবী শ্রেনির অনেক মানুষকেও হিন্দুদের বিরুদ্ধে উস্কেছে। সমগ্র উপন্যাসে সামু চরিত্রটি বোধ হয় সবথেকে বেশী দ্বিধা দ্বন্দের মধ্যে দিয়ে গেছে। এই সামুই অন্যত্র তার বাল্যসাথী মালতী যখন তাকে জিজ্ঞাসা করে যে দ্যাশটা কি শুধু তাদের তার উত্তরে বলে –

> “ক্যান আমার জাতভাইদের হইব, দ্যাশটা তোর আমার সকলের।”[৬]

এই দ্বন্দ শুধু সামুর নয় এ দ্বন্দ আপামর বাঙালিজাতির। সামু মুখে বলে মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র চাই কিন্তু আদতে সংগোপনে তার বাল্যসাথী মালতীর কথা মনে পড়ে। মালতীর স্বামী ঢাকার রায়াটে মারা গেলে তার জন্য নিজেকে অপরাধী মনে করে। এক সময় জনসভাতে বক্তৃতা দিয়েছিল ‘ওদের জমিতে খাটলে আপনি খান, আপনার নাম মুসলমান’।[৭] এই স্লোগানের মাধ্যমের দরিদ্র, শ্রমজীবী মানুষকে প্ররোচিত করা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী কালে সেই সামুর দৃষ্টিভঙ্গি ও পরিবর্তিত হয়। গ্রামের সারল্যভরা জীবনের সাথে তার দুরত্ব বাড়ে। ধর্ম কে সামনে রেখে তার রাজনৈতিক জীবনে সফলতা এলেও, তার আর্থিক উন্নয়ন ঘটলেও, হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বাঙ্গালীর ভাষা ভিত্তিক ঐক্যকে সে অস্বীকার করতে পারেনি। হিন্দুদের নিজের দেশ থেকে উচ্ছেদ করলেও কাঙ্খিত স্বাধীনতা আসেনি। তাই আবার তাদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করতে হয়েছে। ক্রমে উপন্যাসে তৎকালীন পাকিস্থানএর রাষ্ট্রভাষা উর্দুর প্রচলন ও তাকে ঘিরে ফতিমা (সামুর কন্যা) ও সফিকুরের প্রতিবাদ, লড়াই, ভাষা আন্দোলন সবই উঠে এসেছে। রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে সফিকুরের মৃত্যু ঘটেছে। সফিকুরের মৃত্যু প্রমান করেছে, সামুরা যে হিন্দুদের উৎখাত করেছিল তারাও বাস্তবে বাঙ্গালীই ছিল। ধর্ম বা ধর্মীয় মতাদর্শ বাঙালী মুসলিম সমাজকে স্বাধীনতার আস্বাদ দিতে পারেনি। ধীরে ধীরে বাঙালী হিন্দুদের প্রতি তার বিদ্বেষ, সহানুভূতিতে পরিবর্তিত হয়েছে। সামু ধীরে ধীরে বুঝতে পেরেছে আসল স্বাধীনতার মর্ম। আলাদা ‘মুসলিম রাষ্ট্র গঠন’ নামক সোনার হরিনের পেছনে ছুটে চলা সাম্প্রদায়িক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ সামু উপন্যাসের শেষ পর্বে এসে আত্ম প্রতারণাকে স্বীকার করে নেয়। সামু বহুবারই গ্রামে এসেছে কিন্তু মালতীর প্রতি হওয়া অন্যায়ের হেতু অপরাধ বোধে ভুলেও হিন্দু পাড়ার দিকে যায় নি। শেষ পর্যন্ত তার উপলব্ধির কথা সে তার নিজ মুখে উপন্যাসের শেষে স্বীকার করেছে–

> “দেশ ভাগের পর পরই সে ভেবেছিল তবে বুঝি এইবারে সব মিলে গেল- কিন্তু হায়, যত দিন যায়- সে দেখতে পায় সংসারে সবাই পাখিটাকে ছেড়ে দিয়ে বসে থাকে আবার খুঁজে বেরায়। পেলে মনে হয় পাখী মিলে গেছে, দু দিন যেতে না যেতেই মনে হয় পাখীটা আর নীল রং এর নয়, কেমন অন্য রং হয়ে গেছে। সে বলল এটা আমাদের জীবন মরণের সামিল থামলে চলবে না। আমাদের সংগ্রাম চলছে চলবে।”[৮]

দেশভাগের হাত ধরে তৎকালীন সমাজে বেশ কিছু সুযোগ সন্ধানী মানুষের জন্ম হয়। এরা সাধারণ মানুষের দুর্বলতা, অসয়হতার সুযোগ নিয়ে নিজেরা প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল। অপর দিকে স্বার্থ সন্ধানী জোতদার শ্রেণী কিন্তু দরিদ্র, ভূমিহীন কৃষকদেরকে ধর্ম ও সামাজিক বৈষম্যএর দোহাই দিয়ে হিন্দুদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেছে। তারা সুযোগ খুঁজেছে কিভাবে হিন্দুদের কাছ থেকে জলের দরে জমি কিনে নেওয়া যায়। যেমন হাজি সাহেব ঠাকুর বাড়ির জমি কিনে নেয়।অথবা কিভাবে হিন্দু নারী কে অপহৃত কর ভোগ করা যায়। তাইতো রাতের অন্ধকারে করিম শেখের নৌকো মালতিকে তুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। উপন্যাসে এই চরিত্রগুলি ইতিহাসের সাক্ষ্যই বহন করে। সাম্প্রদায়িকতা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দুটি জাতির পারস্পারিক বিদ্বেষ এমন পর্যায়ে পৌছয় যার অবশ্যম্ভাবী ফল হয়ে ওঠে দেশভাগ। অর্থ উপার্জনের জন্য যে কোনো

পথ অবলম্বন করা, মানবিকতা পরিত্যাগ করা, সকল রকম আদর্শ বিসর্জন দিয়ে আত্মসুখ, আত্মসিদ্ধি লাভ করা যেন সমাজের এক শ্রেনীর মানুষের জন্য সাধারণ বিষয় হয়ে ওঠে। কুসংস্কার, অন্ধ ধর্মাচরন যেন একশ্রেণীর মানুষকে ক্রমশ গ্রাস করে। বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমানের দীর্ঘদিনের আত্মিক সম্পর্ক, বন্ধন সব শিথিল হয়ে পড়ে। এক সময় যে বাঙালী বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে একাত্ম হয়েছিল তারাই পরবর্তী সময়ে একে অন্যেকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখতে শুরু করে। তবে অন্য দিকে জোটন এর স্বামী তাকে তার দাদার এর কাছে দিতে গিয়ে ওলাওঠাতে মারা যায়। এখানে জটনের স্বামীর কর্তব্য বোধ তাকে প্রকৃত মানুষ হিসেবে চিহ্নিত করে।

হিন্দুদের ও আজন্ম লালিত সংস্কার কোন কোন ক্ষেত্রে কুসংস্কার, ছোঁয়া ছুয়ি, বাছ বিচারের হাত ধরে উভয় জাতির মধ্যে দুরত্বকে বৃদ্ধি করে। আনন্দময়ী মন্দিরের পাশের জমিতে নামাজ পরাকে কেন্দ্র করে সমস্যা আর বেড়ে ওঠে। অন্যত্র দেখতে পাই মুসলিম জাতিকে ছুঁয়ে ফেলার অপরাধে সোনাকে খাবার খেতে দেওয়া হয়নি। এমন কি বহু চেষ্টা করেও ফতিমা পৈতার সময় সোনার সাথে দেখা করতে পারেনি। আবার অনেক জায়গাতেই মুসলিম সম্প্রদায়কে ছোঁয়ার অপরাধে বার বার স্নান করার কথা উঠে এসেছে। আচার আচরন, লোকাচার, বিশ্বাসে পার্থক্য থাকলেও বহুদিন ধরে একত্র সহাবস্থানের ফলে পাশাপাশি এই দুই সম্প্রদায় নিজেদের সীমা অতিক্রম না করেই কিন্তু শান্তিপূর্ণ ভাবে অবস্থান করছিল। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সংখ্যা গরিষ্ঠ ভারতবাসীকে বহু আগে থেকেই শাসন কারজে সুবিধার অজুহাতে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। 'বিভেদ করে শাসন কর' এই নীতির প্রলোভন, ধীরে ধীরে দুই জাতির মধ্যে সমন্বয় ও ঐক্যকে বিনষ্ট করে। পরিনামে দেশীয় নেতারা নিজ নিজ স্বার্থ রক্ষায় ওপর সম্প্রদায়কে শত্রু বলে চিনহিত করতে শুরু করে। ফলে সমস্ত দেশ জুড়ে সাম্প্রদায়িক চিন্তাভাবনার প্রসার ঘটে। পরিনামে দাঙ্গা, বিদ্বেষ, মানুষের বাস্তুচ্যুতি ও উদ্বাস্তু সমস্যা।

দেশভাগের পেছনে বেশ কিছু কারণ ছিল। এগুলির মধ্যে আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে হিন্দুরা বিদেশি রীতিনীতি সাথে মিল খায়িয়ে নিলেও মুসলিমরা তা পারেনি। তারা অশিক্ষা ও কুসংস্কার এর মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে গেল। সাধারন মুসলিমরা ধর্মকে আরও বেশী আঁকড়ে ধরল। জাতীয় কংগ্রেস ও তার চিহ্নকে তারা হিন্দুয়ানির প্রতীক হিসেবে মনে করতে লাগল। অভিজাত শ্রেণীর মুসলিমরা নিজেদের গোষ্ঠীর কথা ভেবে স্বতন্ত্র জাতিসত্তা ও সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে, ধর্মকে অস্ত্র করে ১৯৪০ সালের 'পাকিস্থান প্রস্তাব' পাশ করিয়ে ফেলল। যা পরবর্তী কালে দেশভাগের প্রত্যক্ষ কারণ হয়ে দাঁড়াল। এতে আরও মদত দিল ১৯৪৬ এর মাউন্টব্যাটেনের 'বিভেদ করে শাসন কর' নীতি। ফলস্বরূপ দুই জাতির মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক বিষিয়ে উঠল, জন্ম হল 'হিন্দুর দেশ', 'মুসলিমের দেশ' ভাবনার। দুই জাতির মধ্যকার আত্মিক সম্পর্ক নষ্ট হয়ে গেল। ফলশ্রুতি হিসেবে দেশ ভাগ হয়ে গেল।

দেশভাগ, দাঙ্গা ইত্যাদির আঘাতে যে চরিত্রটি এই উপন্যাসে নিঃস্ব, রিক্ত হয়েছে তার নাম হল মালতী। ভরা যৌবনে সে তার স্বামীকে হারিয়েছে। হিন্দু সমাজে বিধবাদের যে কঠোর বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করতে হতো তাও সে ভোগ করেছে। তার খাদ্যাভাস তার দাদা নরেনকে পীড়িত করেছে। কিন্তু সে সবথেকে বেশী কষ্ট পেয়েছে তার বাল্যবন্ধু সামুর ব্যবহারে। যার সাথে ছোটবেলায় একসাথে সে খেলে বড় হয়েছে সেই যখন মুসলিম লীগের পতাকা টাঙ্গায় তখন তার আমানবিক কষ্ট হয়। আবার করিম শেখের লোভের বলি হতে হয়েছে তাকে। ধর্ষিত হয়েছে সে। ভালবাসার মানুষ রঞ্জিত এর সাথে পালিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখলে, সে ও মারা গেছে। কিন্তু এত বিপর্যয়ের মাঝেও মালতী চরিত্রটি উপন্যাসের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত জীবন যুদ্ধে লড়াই করে টিকে গেছে। তাকে আমরা পুনরায় দেখতে পাই দেশ ভাগের পর ইন্ডিয়া তে। সেখানে সে চাল চোরা চালান এর সাথে যুক্ত হয়ে পরে। তার জীবন সংগ্রামের দিকটি আমাদের সামনে স্পষ্ট হয় যখন দেখি সে তার প্রতি হওয়া সমস্ত অন্যায় এর বদলা নিতে গিয়ে পুলিশ এর কণ্ঠনালী কামড়ে ধরে। যে মালতী একদিন প্রজাপতির মতো নরেন দাসের বাড়িতে উড়ে বেরাত সেই পরবর্তীতে বাঘের মতো কণ্ঠনালী কামড়ে ধরেছে, মালতীর এই রূপান্তর যেন পূর্ববঙ্গ হতে আসা সেই সমস্ত উদ্বাস্তু মানুষের প্রতীক যারা নিজের দেশ হারিয়ে অন্য দেশে এসে একটু অন্ন, বস্ত্র, কিম্বা মাথা গোঁজার ঠাই খুঁজতে এ রকমই মরিয়া হয়ে ওঠে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 257 - 263
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

যে মানুষগুলি এক সময় সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা বাংলাদেশে শান্তিপূর্ণ ভাবে সচ্ছলতার সাথে জীবন কাটাতে পারতো দেশ ভাগের ফলে তাদেরকেই দুমুঠো অন্নের জন্য কঠিন জীবনপথ কে বেছে নিতে হয়েছে। নিজের বাড়ি, বাগান, পুকুর, জমি সব ছেড়ে তারা স্বাধীনতার সুবাদে তারা হয়ে গেল গৃহহারা, হয়ে গেলো উদ্বাস্তু। এপারে এসে খুব সহজেই তাদের গায়ে 'বাঙাল' তকমা লাগিয়ে দেওয়া সহজ হল। এ যেন মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ এক স্থান থেকে অন্য স্থানে খাদ্য, জল, নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় পাড়ি দিতো। নতুন স্থানে নতুন বসতি গড়ে তথেছে। প্রাগ-ঐতিহাসিক যুগ হতেই নারী পুরুষ উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টায় সভ্যতা গড়ে উঠেছে। দেশভাগ, দেশত্যাগ সেইসাথে যোগ হয়েছিলো স্বভূমি থেকে উৎখাত হয়ে উদ্বাস্তু হওয়ার মানসিক যন্ত্রণা। এই রকম পরিস্থিতিতে বাড়ির মেয়েদের আর ঘরের কোনে পড়ে থাকা সম্ভব হয় না। তাদের রাস্তায় জীবিকার সন্ধানে বার হতে হয়। এই উপন্যাসে মালতিও খেটে খাওয়া সেই সমস্ত মেয়েদের প্রতিনিধিত্ব করে যারা পূর্ববঙ্গ থেকে বিতাড়িত হয়ে অন্য দেশে এসে ঠিক জীবন যুদ্ধে যুদ্ধ করতে শিখে যায় এবং শেষ পর্যন্ত উপন্যাসে টিকে থাকে।

সবশেষে আমরা এই উপন্যাসে সবথেকে কনিষ্ঠ চরিত্র– 'সোনা' র কথা বলব। তার জন্মের ঘটনা দিয়েই এই উপন্যাসের শুরু। সোনা ও প্রকৃতি যেন এই উপন্যাসে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। একটি ছোট শিশুর চোখ দিয়ে লেখক পূর্ববাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে ও লৌকিক আচার আচরণকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। তরমুজের খেত ঈশম শেখের সাথে সোনার সময় কাটানো, গ্রাম বাংলার বর্ষার রূপ, শরতের রূপ, ধান খেত, পুজোর বলি প্রদত্ত কাটা মোষের মাথা ও শিশুমনে তার প্রতিক্রিয়া এ সবই উপন্যাসে সোনার দৃষ্টিতে ব্যক্ত হয়েছে। সোনার সাথে গ্রাম বাংলার যোগসূত্র যেন বারবার আমাদের বিভুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'পথের পাঁচালীর' অপুকে মনে করিয়েছে। যদিও অপু ও সোনার আর্থসামাজিক অবস্থানের যথেষ্ট পার্থক্য ও আছে। অপু দরিদ্র ব্রাম্ভন সন্তান, তার জীবন নিস্তরঙ্গ। অপরদিকে প্রভাবশালী, আর্থিকভাবে বলীয়ান পূর্ববঙ্গের ব্রাম্ভন সন্তান। তার শৈশব বেশ উত্তেজনাপূর্ণ। সে ঐ ক্ষুদ্র বয়সেই দাঙ্গার সাক্ষী হয়েছে। দেশভাগের ফলে নিজের মাটি থেকে সমূলে উৎপাটিত হয়েছে। আর এইখানেই অপুর কাশী যাত্রার সাথে তার মিল। যারা জীবন যুদ্ধে নানা ঘাত প্রতিঘাতের মোকাবিলা করে গেছে কিন্তু হার স্বীকার করেনি। বাংলা উপন্যাসে কালজয়ী এই দুই চরিত্র নানা উত্থান পতনের মধ্যে দিয়ে জীবনে এগিয়ে চলেছে।

দেশছাড়ার পূর্বে সোনা তার জ্যেঠামশায়ের উদ্দেশ্যে অর্জুন গাছের কাণ্ডে লিখে আসে–

> "জ্যেঠামশায় আমরা হিন্দুস্তানে চলিয়া গিয়াছি, ইতি সোনা।"[৯]

এই বার্তা যেন শুধু তার জ্যেঠামশায়ের জন্য নয় বরং সমগ্র হিন্দু জাতীর জন্য যারা পিছে পড়ে রইল এবং এখন পশ্চিমবঙ্গে পাড়ি দিতে পারলো না। এই উপন্যাসের সবথেকে বাস্তব সত্য যেন সোনার লেখা ঐ এক লাইন। মালতীর মতো সোনার রূপান্তরও পাঠক মনে গভীর ক্ষত তৈরি করে বিত্তশালী ঠাকুর পরিবার পূর্ববাংলায় অবস্থানকালে যারা অন্ন বস্ত্রের অভাব কোনদিন বুঝতে পারেনি, উল্টে তারাই দুঃস্থ, দরিদ্র মানুষকে সাধ্যমতো সাহায্য করেছে তারা উদবাস্তু হয়ে হালিশহরের ক্যাম্পে আসার পর চরম দারিদ্রতার সম্মুখীন হয়েছে। এক সময় 'পাগল ঠাকুর' নৌকো নিয়ে বেরোলে গ্রামবাসীরা যে যার সাধ্য মতো ফসল, ফল তাকে ভেট দেওয়ার মতো করে তার নৌকোতে তুলে দিত। কিন্তু হালি শহরে আসার পর থেকে তাদের শুধু পেপে সেদ্ধ বা মিষ্টি কুমড়ো সেদ্ধ খেয়ে দিন কাটাতে হয়। তাইতো সোনা বাবু দুটি গরম ভাত আর ভেড়ার মাংস খাওয়ার জন্য অমানুষিক কষ্ট সহ্য করে জাহাজের চাকরিতে সম্মত হয়। এমনকি 'বিফ' খেতেও সম্মত হয়েছে। সংসার এর দুঃখ ঘোচাতে, মা ও ছোট ছোট ভাই বোন গুলোর কথা ভেবে তার আজন্মলালিত সংস্কার কেও বিসর্জন দিয়েছে। যে মানুষগুলো এক সময় পৈতৃক ভিটেতে নিশ্চিন্তে কালাতিপাত করতো দেশভাগের পরবর্তী সময়ে তারা এক কঠিন, বাস্তব, নির্মম সত্যের সম্মুখীন হয়। জীবনের উত্থান পতন সোনার থেকে বেশী আর কেউ হয়তো উপলব্ধি করতে পারেনি।

এছাড়াও আর অনেক চরিত্রই অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসের প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছেন এবং সেগুলিকেও সার্থক ভাবে রূপ দিয়েছেন। পূর্ববঙ্গের আঞ্চলিক ভাষাভঙ্গি এই উপন্যাসের প্রতিটি চরিত্রকে জীবন্ত করে তোলে। এই

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iii, July 2024, tirj/July 24/article - 31
Website: https://tirj.org.in, Page No. 257 - 263
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

প্রবন্ধে দেশভাগ, হিন্দুমুসলমান দ্বন্দ্ব, আবার তাদের পারস্পারিক সহাবস্থান এসব বোঝাতে যে চরিত্রগুলি সবথেকে বেশী অবদান রাখে তা আলোচনা করা হল। লেখক টুকরো টুকরো ঘটনার মাধ্যমে স্বাধীনতার সময়পর্ব ততকালীন রাজনৈতিক ঘটনাবলীর বিশ্বাস যোগ্য উপস্থাপন করেছেন। কল্পনার মিশেল থাকলেও ঘটনাগুলি ইতিহাসানুগ ভাবেই বর্ণিত। উপন্যাসে বার বার লেখক ১৯৩৭ এর পৃথক নির্বাচন, উত্তর প্রদেশে মুসলিম লীগের দাবী, ফজলুল হক সাহেবের বিভিন্ন দাবী দাওয়া উঠে এসেছে।[১০] যা উপন্যাসটিকে ইতিহাসানুগ ভাবে আরও বিশ্বাস যোগ্য করে তুলেছে। দেশভাগের সাথে সাথে উপন্যাসে চরিত্রগুলি আর্থ সামাজিক পরিবর্তন ঘটেছে তাই নয় তাদের আদর্শগত পরিবর্তন ও ঘটেছে। এতো শুধু উপন্যাস নয়, এ লেখক এর আত্মজীবনী মুলক অভিজ্ঞতাও বটে। ‘সাহিত্য সমাজের দর্পণ’ এ কথাটি বহুল প্রচলিত। তবে সাহিত্য শুধু সমাজের দর্পণ নয়, বরং বলা ভাল সাহিত্য শিল্প ও কল্পনার মিশেলে সমাজের নানা ঘটনাবলীর শৈল্পিক ও সুন্দর প্রকাশ।

Reference:

১. অতীন বন্দ্যোপাধ্যায় এর সাক্ষাৎকার : ‘আমার গোটা জীবনটাই তো ভুলে ভরা’, বইয়ের দেশ, এপ্রিল-জুন, ২০১২
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, অতীন, ‘নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে’, করুণা প্রকাশনী, কোলকাতা, ২০০৩, পৃ. ১১০
৩. প্রাগুক্ত, ‘নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে’, পৃ. ৩৭৬
৪. তদেব, পৃ. ১১
৫. তদেব, পৃ. ২৮৪
৬. তদেব, পৃ. ৩১
৭. তদেব, পৃ. ২৮৪
৮. তদেব, পৃ. ৪০৭
৯. তদেব, পৃ. ৩৭৭
১০. তদেব, পৃ. ২৫৪

Bibliography:

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘পলাশী থেকে পার্টিশন’, ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসয়ান, ২০১৬
সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘দেশভাগ দেশত্যাগ’, অনুস্টুপ, মার্চ, ১৯৯৪
হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘উদ্বাস্তু’, শিশু সাহিত্য সংসদ প্রা লি, কলকাতা, ১৯৭০
শঙ্কর ঘোষ, ‘হস্তান্তর’, আনন্দ পাবলিশার্স , কলকাতা, ১৯৯৯